সোফির জগৎ

ইয়স্তাইন গার্ডার

অনুবাদ: জী এইজ হাবিব

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকবৃন্দ

...শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না...

সেদিন বিকেলে সোফির মা যখন কাজ থেকে ফিরে এলেন, সে তখন তার গ্লাইডারে বসে এই দর্শনবিষয়ক কোর্স আর হিল্ডা মোলার ন্যাগের মধ্যকার সম্ভাব্য যোগসূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ভাবছে, নিজের বাবার কাছে থেকৈ জন্মদিনের কার্ড আর পাওয়া হচ্ছে না হিল্ডা মোলার ন্যাগের।

বাগানের অন্য প্রান্ত থেকে ওর মা ডাকলেন, "সোকি! একটা চিঠি এসেছে তোর।'

শ্বাস বদ্ধ হয়ে এলো সোফির। একটু আগেই ডাক বাক্স খালি করে সব চিঠি নিয়ে এসেছে সে। কাজেই চিঠিটা নিশ্চয়ই সেই দার্শনিকেরই হবে। মাকে এখন সে কী বলবে?

‘চিঠিটায় কোনো ডাকটিকেট নেই । মনে হয়, লাভ লেটার।’

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেয় সোফি ।

‘‘খুলবি না?’

একটা অজুহাত দাঁড় করাতে হবে ।

'কখনো শুনেছো, মা ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই অবস্থায় কেউ প্রেমপত্র খুলেছে?'

মা ভাবুক গে ওটা একটা প্রেমপত্র । ব্যাপারটা যদিও অস্বস্তিকর, তারপরেও, মা যদি দেখেন ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে এমন একজন পুরোপুরি অচেনা লোকের সঙ্গে সে একটা করেসপন্ডেন্স কোর্স করছে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা এর চাইতে খারাপ হবে।

আগের সেই ছোট্ট খামগুলোর মতোই এটা। ওপরের তলায় নিজের ঘরে পৌঁছে তিনটে নতুন প্রশ্ন পেল সোফি...

এমন কোনো মৌলিক পদার্থ কি আছে যা দিয়ে বাকি সব কিছু তৈরি হয়েছে?

পানি কি মদে পরিণত হতে পারে?

মাটি আর পানি কী করে একটা জীবন্ত ব্যাঙ তৈরি করে?

প্রশ্নগুলো সোফির কাছে নিতান্তই অর্থহীন মনে হলেও সারা সন্ধ্যা ওই প্রশ্নগুলোই ঘুরপাক খেতে লাগল তার মাথার ভেতর। পরদিনও স্কুলে বসে ঐ প্রশ্নগুলোর কথাই ভাবতে লাগল সে, বাজিয়ে দেখতে থাকল প্রত্যেকটাকে।

এমন কোনো মৌলিক পদার্থ কি আছে যা দিয়ে বাকি সব কিছু তৈরি হয়েছে? সে-রকম কোনো কিছু যদি থেকেই থাকে তাহলে সেটা হঠাৎ কী করে একটা ফুল বা হাতি হয়ে যাবে? পানি মদে পরিণত হতে পারে কিনা এই প্রশ্নের বেলাতেও ওই একই আপত্তি খাটে। যিশু কী করে পানিকে মদে পরিণত করেছিলেন সেই রূপক কাহিনী সোফির জানা আছে, কিন্তু গল্পটাকে সে কখনোই আক্ষরিক অর্থে নেয়নি। আর যিশু যদি সত্যি সত্যি-ই পানিকে মদে পরিণত করে থাকেন সেক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে ওটা ছিল একটা অলৌকিক ব্যাপার, যা স্বাভাবিক অবস্থায় করা যেতে পারে না। সোফি জানে, শুধু মদই না, অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীতেও প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। কিন্তু শসার ভেতর পানির

পরিমাণ ৯৫ ভাগ হলেও সেটার মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য জিনিসও আছে, কারণ শসা শসা-ই, পানি নয়।

এরপর রয়েছে সেই ব্যাঙের প্রশ্নটা । ব্যাঙের ব্যাপারে ওর দর্শন শিক্ষকের একটা অদ্ভুত বাতিক আছে দেখা যাচ্ছে।

সোফি হয়ত এটা মেনে নেবে যে ব্যাঙ মাটি আর পানি দিয়ে তৈরি, তবে সেক্ষেত্রে মাটি নিশ্চয়ই একাধিক বস্তুর সৃষ্টি। মাটি যদি ভিন্ন ভিন্ন নানান জিনিস দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এটা খুবই সম্ভব যে মাটি আর পানি একসঙ্গে মিলে ব্যাঙ সৃষ্টি করেছে। অবশ্য, মাটি আর পানি যদি ব্যাঙের ডিম আর ব্যাঙাচির স্তরের ভেতর দিয়ে গিয়ে থাকে তবেই সেটা সম্ভব। কারণ, ব্যাঙ তো আর স্রেফ একটা বাঁধাকপির পিণ্ড থেকে তৈরি হতে পারে না, তা সেটাতে যতই পানি ঢালা হোক না কেন।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সোফি দেখল মোটাসোটা একটা খাম অপেক্ষা করছে তার জন্যে। অন্যান্য দিনের মতো গুহার মধ্যে গা-ঢাকা দিল সে।

দার্শনিকের প্রকল্প

আবার শুরু করছি আমরা! সাদা খরগোশ ইত্যাদির কাসুন্দি বাদ দিয়ে আজ আমরা সরাসরি আগের পাঠে চলে যাবো।

প্রাচীন গ্রিকদের থেকে শুরু করে একেবারে আমাদের আজকের সময় পর্যন্ত লোকজন যেভাবে দর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে তারই একটা খুবই মোটা দাগের ছবি তুলে ধরছি আমি। তবে বিষয়গুলোকে আমরা সঠিক ক্রম অনুযায়ী বেছে নেবো। দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ যেহেতু আমাদের থেকে ভিন্ন সময়ে – একেবারেই ভিন্ন সংস্কৃতিতে-জীবনযাপন করেছেন, তাই প্রত্যেক দার্শনিকের প্রকল্প (project) কী ছিল সেটা বিচার করে দেখাটা খারাপ হবে

বলে মনে করি না। প্রকল্প বলতে আমি বোঝাতে চাইছি এক একজন বিশেষ দার্শনিক ঠিক কোন বিষয়টি জানার জন্য উৎসুক সেটা অবশ্যই আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। একজন দার্শনিক হয়ত জানতে চান গাছপালা এবং জীবজন্তু কীভাবে এলো। অন্য আরেকজন হয়ত জানতে চান ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা বা মানুষের আত্মা অমর কিনা।

বিশেষ একজন দার্শনিকের প্রকল্প কী সেটা একবার বুঝতে পারা গেলে তাঁর চিন্তার সূত্র অনুসরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, তার কারণ কোনো দার্শনিকই দর্শনশাস্ত্রের পুরোটা নিয়ে ভাবিত হন না।

দার্শনিকের চিন্তার সূত্র বলতে পুরুষ দার্শনিকই বুঝিয়েছি তার কারণ এটা এক অর্থে পুরুষদেরও গল্প। অতীতকালের নারীদেরকে নারী এবং চিন্তাশীল মানুষ এই দুই দিক থেকেই অবদমিত করে রাখা হয়েছিল, যা খুবই দুঃখজনক, কারণ এর ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার একটি বিরাট অংশই হারিয়ে গেছে। এই শতাব্দীর আগে তোমাকে কোনো হোমওয়ার্ক... মানে অংকের জটিল কোনো প্রশ্ন বা সে-ধরনের কিছু দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই আর ইংরেজি ভার্ব কনজুগেট করার ব্যাপারেও আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তবে মাঝে মাঝে আমি ছোট খাটাে দু-একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেবো তোমাকে।

এ-সব শর্ত মানতে যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা শুরু করব।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকবৃন্দ

একেবারে গোড়ার দিককার গ্রিক দার্শনিকদের কখনো কখনো প্রকৃতিবাদী দার্শনিক বলা হয়ে থাকে, কারণ তারা মূলত প্রাকৃতিক জগৎ আর সেটার ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন।

প্রত্যেকটি জিনিস কোথা থেকে এলো সে-প্রশ্ন আমরা এরই মধ্যে করে ফেলেছি। ইদানিং অনেকেই মনে করছেন কোনো এক সময় কোনো একটা কিছু নিশ্চয়ই একেবারে শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রিকদের মধ্যে এই ধারণাটি খুব একটা বিস্তার লাভ করেনি। কোনো না কোনো কারণে তারা ধরেই নিয়েছিল যে কিছু একটা সব সময়ই ছিল।

কাজেই, শূন্য থেকে কী করে সব জিনিস সৃষ্টি হতে পারে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল না। পানি থেকে কী করে জ্যান্ত মাছ সৃষ্টি হচ্ছে বা প্রাণহীন মাটি থেকে কী করে বিরাট বিরাট গাছ আর রং-বেরং-এর অসাধারণ সব ফুলের জন্ম হচ্ছে সে-সব নিয়েই বরং মাথা ঘামাতো গ্রিকরা। মায়ের গর্ভ থেকে কী করে শিশুর জন্ম হয় তা নিয়ে-ও যে ভাবতো সে-কথাতো বলাই বাহুল্য।

দার্শনিকেরা সচক্ষেই দেখতে পেতেন যে প্রকৃতিতে নানান রূপান্তর ঘটছে। কিন্তু এ-সব রূপান্তর কীভাবে ঘটতে পারে?

এই যেমন ধরো, একটি প্রাণহীন বস্তু থেকে সজীব একটা কিছু কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে? একেবারে গোড়ার দিককার দার্শনিকেরা সবাই বিশ্বাস করতেন যে সব ধরনের পরিবর্তনের মূলে কোনো একটা মৌলিক বস্তু থাকতেই হবে। তবে কী করে যে তারা এই ধারণায় পৌছেছিলেন সে-কথা বলা শক্ত। আমরা কেবল এটুকু জানি একটা ধারণা বিকশিত হচ্ছিল যে প্রকৃতির সমস্ত পরিবর্তনের গুপ্ত কারণটি অবশ্যই একটি মৌলিক বস্তু। কিছু একটা নিশ্চয়ই রয়েছে যা থেকে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে এবং যার কাছে সব কিছু ফিরে যায়।

আমাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় আসলে কিন্তু এটা নয় যে প্রাচীনতম এই দার্শনিকেরা কোন সমাধানে পৌছেছিলেন, বরং এটা যে তারা কী কী প্রশ্ন করেছিলেন এবং কোন ধরনের উত্তর খুঁজছিলেন। তারা কী চিন্তা করেছিলেন সেটার চাইতে তারা কোন পদ্ধতিতে চিন্তা করেছিলেন সে-ব্যাপারেই বরং আমরা বেশি উৎসাহী।

আমরা জানি যে, প্রাকৃতিক জগতে তারা যে-সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ করতেন সেসম্পর্কেই বিভিন্ন প্রশ্ন উথাপন করতেন তারা। প্রকৃতি যে-সব নিয়ম-কানুন মেনে চলে সে-সব নিয়ম-কানুনের খোঁজ করছিলেন তারা। প্রাচীন পুরাণের সাহায্য ছাড়াই বুঝতে চেষ্টা করছিলেন তাদের চারপাশে কী ঘটে চলেছে। আর সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, খোদ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তারা বুঝতে চেয়েছিলেন আসল প্রক্রিয়াগুলো। দেবতাদের গপ্পো ফেঁদে বজ্র আর বিদ্যুৎ বা শীত ও বসন্তের ব্যাখ্যা দেয়া থেকে একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার ছিল এটা।

অর্থাৎ, ধর্ম থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছিল দর্শন। আমরা বলতে পারি, সবার আগে প্রকৃতিবাদী দার্শনিকেরাই বৈজ্ঞানিক বিচারের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন আর তার ফলে হয়ে উঠছিলেন পরবর্তীকালে যা বিজ্ঞান নামে চিহ্নিত হবে তারই পথিকৃৎ।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকেরা যা বলে বা লিখে রেখে গেছেন তার খণ্ডাংশই মাত্র টিকে আছে। অল্প যেটুকু আমরা জানি সেটুকু পাওয়া যায় অ্যারিস্টটলের লেখায়, যিনি সেই সব দার্শনিকের দুশো বছর পর পৃথিবীতে বাস করে গেছেন। তারা যে-সব সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন কেবল সেগুলোর কথাই উল্লেখ করেছেন তিনি। কাজেই, ঠিক কোন পথ অনুসরণ করে তারা সে-সব সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন সে-কথা সব সময় জানা যায় না। তবে আমরা যেটুকু জানি তা দিয়ে এটুকু অন্তত প্রমাণ করা যায় যে প্রাচীনতম দার্শনিকদের প্রকল্পের বিবেচ্য বিষয় ছিল একটি মৌলিক, গঠনকারী উপাদান আর প্রকৃতিতে ঘটা নানান পরিবর্তন।

মিলেটাস-এর তিন দার্শনিক

আমরা যে-সব দার্শনিকের কথা জানি তাদের মধ্যে সর্ব প্রথম হচ্ছেন থেলিস (Thales) তার বাড়ি ছিল এশিয়া মাইনরের এক গ্রিক উপনিবেশ মিলেটাস-এ। বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন তিনি, তার মধ্যে মিশরও আছে; বলা হয়, সেখানে তিনি একটি পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয় করেছিলেন আর তা তিনি করেছিলেন ঠিক এমন একটি সময়ে সেটার ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে যখন তার নিজের ছায়ার দৈর্ঘ্য হয়ে দাড়িয়েছিল তার উচ্চতার সমান। আরও বলা হয়, ৫৮৫ খ্রিস্ট পূর্বাদে তিনি নাকি একটি সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

থেলিস মনে করতেন, পানিই সবকিছুর উৎস। এ-কথা দিয়ে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন আমরা জানি না, তবে তিনি হয়ত বিশ্বাস করতেন যে পানি থেকেই সমস্ত প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল আর সমস্ত প্রাণই ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর পানিতে ফিরে যায়।

নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চল থেকে বন্যার পানি সরে গেলে কীভাবে শস্য জনাতে শুরু করত সেটা নিশ্চয়ই তিনি খেয়াল করে থাকবেন মিশর-ভ্রমণের সময়। হয়ত তিনি এটাও খেয়াল করেছিলেন যে, যেখানেই বৃষ্টি শুরু হোক না কেন সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ব্যাঙ আর নানান পোকা-মাকড় এসে হাজির হয়।

এটা খুবই সম্ভব যে পানি কী করে বরফে পরিণত হয় বা বাম্পে আর তারপর ফের পানিতে, সেটা নিয়ে থেলিস মাথা ঘামিয়েছিলেন।

এটাও ধারণা করা হয় যে থেলিস বলেছিলেন, সব জিনিসই নানান দেবতাতে পরিপূর্ণ। এ-কথার মাধ্যমে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন আমরা সেটা অনুমান করতে পারি কেবল। ফুল ও শস্য থেকে শুরু করে পোকামাকড় ও তেলাপোকা এসবের প্রতিটি জিনিসেরই উৎস যে কী করে কালো মাটি হতে পারে সেটা পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি সম্ভবত কল্পনা করে নিয়েছিলেন যে মাটি

প্রাণের অদৃশ্য সব ক্ষুদে ক্ষুদে জীবাণুতে পরিপূর্ণ। তবে একটা কথা ঠিক, তিনি কিন্তু হোমারের দেবতাদের কথা বোঝাচ্ছিলেন না মোটেও।

এরপর যে-দার্শনিকের কথা আমরা শুনতে পাই তিনি অ্যানাক্সিম্যান্ডার (Anaximander); থেলিস যে-সময়ে মিলেটাসে বাস করতেন সে-সময়ে তিনিও সেখানেরই বাসিন্দা ছিলেন। তিনি মনে করতেন আমাদের বিশ্ব হচ্ছে সেই সব অগুনতি বিশ্বেরই একটি বিশ্ব যে-সব বিশ্ব, তার ভাষায়, অসীমেই উদ্ভব হয়ে ফের অসীমে মিলিয়ে যায়। অসীম বলতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন সেটা নির্ণয় করা অবশ্য খুব সহজ নয়, তবে এ-ব্যাপারটি স্পষ্ট বলেই মনে হয় যে থেলিস যেভাবে একটি জানা বস্তুর কথা ভেবেছিলেন সে-রকম কোনো বস্তুর কথা তিনি ভাবেননি। হয়ত তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যে-জিনিসটি সব কিছুর উৎস সেটাকে অবশ্যই সৃষ্ট জিনিসগুলো থেকে ভিন্ন হতে হবে। সৃষ্ট সমস্ত জিনিসই যেহেতু সসীম তাই যা সৃষ্টির আগে এবং পরে আসে তা অবশ্যই অসীম। একটা কথা বেশ বোঝা যায় যে এই মৌলিক বস্তুটি আর যাই হোক, পানির মতো সাধারণ কিছু নয়।

মিলেটাসের তৃতীয় দার্শনিক হলেন অ্যানারিমেনিস (Anaximenes, আনু, ৫৭০-৫২৬ খ্রি. পূ.)। তিনি মনে করতেন সব কিছুর উৎস নিশ্চয়ই বাতাস কিংবা বাষ্প। থেলিসের পানি-তত্ত্বের কথা নিশ্চয়ই জানা ছিল তার। কিন্তু কথা হচ্ছে সেই পানি কোথা থেকে আসে? অ্যানাক্সিমেনিস মনে করতেন পানি হলো ঘনীভূত বাতাস। আমরা দেখতে পাই, যখন বৃষ্টি হয় তখন বাতাস থেকে পানি নিংড়ে নেয়া হয়। পানিকে আরও বেশি নিংড়ানো হলে সেটা মাটি হয়ে যায়, এমনই ভাবতেন তিনি। গলনশীল বরফ থেকে কীভাবে মাটি আর বালু নিংড়ে বের করা হয় সেটা হয়ত তিনি দেখে থাকবেন। তিনি আরও মনে করতেন, আগুন হচ্ছে পরিশুদ্ধ বাতাস। আর তাই অ্যানাক্সিমেনিসের মতে বাতাস হচ্ছে মাটি, পানি আর আগুনের উৎস।

মাটি থেকে উৎপন্ন ফসল আর পানির মধ্যে সম্পর্ক খুব দূরের কিছু নয়। অ্যানাক্সিমেনিস হয়ত ভেবেছিলেন প্রাণের সৃষ্টির জন্য মাটি, বাতাস এবং আগুন সবই দরকার, কিন্তু সব কিছুরই উৎস হচ্ছে বাতাস বা বাষ্প। কাজেই থেলিসের মতো তারও মনে হয়েছিল যে সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পেছনে নিশ্চয়ই একটি বস্তু রয়েছে।

শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না

মিলেটাসের এই তিন দার্শনিকই সমস্ত কিছুর উৎস হিসেবে একটি মৌলিক বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু একটি জিনিস হঠাৎ কী করে অন্য একটি জিনিসে পরিবর্তিত হতে পারে? এটাকে আমরা বলতে পারি পরিবর্তনের সমস্যা।

৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাদের দিকে দক্ষিণ ইতালিতে অবস্থিত গ্রিক উপনিবেশ ইলিয়া-য় একদল দার্শনিক বাস করতেন। ইলিয়াটিক নামে পরিচিত এই দার্শনিকেরা এই প্রশ্নটির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন।

এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন পার্মেনিদেস (Parmenides আনু. ৫৪০ - ৪৮০ খ্রি. পূ.)। তিনি মনে করতেন যে-সব জিনিস আছে তা বরাবরই ছিল। গ্রিকদের কাছে এই ধারণাটি অপরিচিত ছিল না। এ-ব্যাপারটা তারা একরকম ধরেই নিয়েছিল যে জগতে যে-সব জিনিস রয়েছে সেগুলো চিরস্থায়ী। পার্মেনিদেস মনে করতেন, শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। আর ঠিক একইভাবে, যে-জিনিসটি আছে সেটি হঠাৎ করে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়তে পারে না।

তবে পার্মেনিদেস এই ধারণাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, পরিবর্তন বলে আসলে কিছু নেই। কোনো কিছুই সেটা যা তা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

অবশ্য পার্মোনদেস এ-কথা ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। তিনি তার ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে সব কিছু বদলে যায়। কিন্তু তার প্রজ্ঞা তাকে যা বলছিল তার সঙ্গে তিনি এটাকে মেলাতে পারেননি। কিন্তু তার ইন্দ্রিয় আর প্রজ্ঞার মধ্যে থেকে যে-কোনো একটির ওপর ভরসা রাখতে যখন তিনি বাধ্য হলেন তখন তিনি প্রজ্ঞাকেই বেছে নিলেন।

না দেখলে বিশ্বাস নেই, এই কথাটির সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত তুমি। কিন্তু পার্মেনিদেস এমনকি সব কিছু দেখেও তা বিশ্বাস করতে রাজি হননি। তিনি মনে করতেন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো জগতের একটি ক্রটিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে আমাদের সামনে, এমন এক চিত্র যার সঙ্গে আমাদের প্রজ্ঞা একমত হয় না। দার্শনিক হিসেবে, সব ধরনের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত বিভ্রমের কথা সবাইকে জানানো নিজের কর্তব্য বলে মনে করতেন তিনি।

মানব প্রজ্ঞার ওপর এই অটল আস্থাকে বলা হয় বুদ্ধিবাদ (rationalism)। তিনিই বুদ্ধিবাদী যিনি মনে করেন মানব প্রজ্ঞাই জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রাথমিক উৎস।

সব কিছুই বয়ে চলে

হেরাক্লিটাস (Heraclitus আনু. ৫৪০-৪৮০ খ্রি. পূ.) নামে পার্মেনিদেস-এর সমসাময়িক এক দার্শনিক ছিলেন। এশিয়া মাইনরের এফিসাস-এর বাসিন্দা ছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন সার্বক্ষণিক পরিবর্তন প্রকৃতির সবচেয়ে

মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আমরা সম্ভবত বলতে পারি যে তিনি যা কিছু প্রত্যক্ষ করতেন সে-সবের ওপর তার পার্মেনিদেসের চেয়ে বেশি আস্থা বা বিশ্বাস ছিল।

হেরাক্লিটাস বলতেন, সব কিছুই বয়ে চলে। প্রতিটি জিনিসই নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল, কোনো কিছুই স্থির নয়। কাজেই আমরা একই নদীতে দুবার নামতে পারি না। দ্বিতীয়বার যখন আমি নদীতে নামি তখন আমি বা নদী কেউ-ই আর আগের মতো নেই।

হেরাক্লিটাস দেখিয়েছিলেন যে বৈপরীত্যই এ-জগৎকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে। কখনোই অসুখে না পড়লে সুস্থ থাকা কী আমরা তা বুঝতাম না। ক্ষুধা কী তা না জানলে পেট ভরা থাকার মজা টের পেতাম না আমরা। কখনো কোনো যুদ্ধ না হলে শান্তির মর্যাদা বুঝতে পারতাম না আমরা। শীতকাল না থাকলে বসন্ত কখনো দেখতে পেতাম না আমরা।

হেরাক্লিটাস বিশ্বাস করতেন বস্তুর ক্রম বিন্যাসে ভালো আর মন্দ এই দুইয়েরই যার যার অপরিহার্য স্থান রয়েছে। বিপরীতের এই নিত্য আন্তঃসম্পর্ক না থাকলে জগতের অস্তিত্ব থাকতো না।

পরিতৃপ্তি-ই হচ্ছে ঈশ্বর। ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করলেও, স্পষ্টতই তিনি তা দিয়ে পুরাণের দেবতাদের কথা বোঝাননি। হেরাক্লিটাসের কাছে ঈশ্বর বা দেবতা ছিল এমন একটা কিছু যা সমস্ত জগৎকে জড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে, প্রকৃতির নিয়ত রূপান্তর আর পরিবর্তনের ভেতরই সবচেয়ে ভালোভাবে পাওয়া যায় ঈশ্বরকে।

ঈশ্বর কথাটির বদলে হেরাক্লিটাস প্রায়ই গ্রীক শব্দ লোগোস (logos) ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ প্রজ্ঞা। আমরা মানুষেরা হয়ত সব সময় একই রকম চিন্তা-ভাবনা করি না বা সবারই হয়ত একই মাত্রার প্রজ্ঞা নেই, কিন্তু, হেরাক্লিটাস বিশ্বাস করতেন যে, নিশ্চয়ই কোনো এক ধরনের বৈশ্বিক প্রজ্ঞা রয়েছে যার নির্দেশনা অনুযায়ীই প্রকৃতির সব কিছু ঘটে।

এই ‘বৈশ্বিক প্রজ্ঞা বা বৈশ্বিক আইন’ এমন একটি বস্তু যা আমাদের সবার মধ্যেই বিদ্যমান এবং এর দ্বারাই আমরা চালিত হ । কিন্তু তারপরেও, বেশিরভাগ মানুষই তাদের নিজস্ব প্রজ্ঞা নিয়েই জীবনযাপন করে বলে মনে করতেন হেরাক্লিটাস। এমনিতে অবশ্য তিনি তার চারপাশের সাধারণ মানুষকে ঘৃণাই করতেন। তিনি বলতেন, বেশিরভাগ মানুষের মতামতই শিশুর খেলনার মতো মামুলি।

অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর নিয়ত পরিবর্তন এবং বৈপরীত্যের মধ্যে হেরাক্লিটাস একটি সত্তা (Entity) বা একত্ব-র দেখা পেয়েছিলেন। এই কিছু, যা সব কিছুর উৎস, তাকেই তিনি বলেছিলেন ঈশ্বর বা লোগোস।

চারটি মৌলিক উপাদান

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পার্মেনিদেস আর হেরাক্লিটাস ছিলেন একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। পার্মেনিদেস-এর প্রজ্ঞা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে কোনো কিছুরই পরিবর্তন হতে পারে না। হেরাক্লিটাস-এর ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ-ও (sense perception) ঠিক একইভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। দু'জনের মধ্যে কার কথা ঠিক? আমরা কি প্রজ্ঞাকেই মাতব্বরি ফলাতে দেবো, নাকি ভরসা রাখবো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর?

পার্মেনিদেস আর হেরাক্লিটাস দু'জনেই দুটো করে কথা বলেছেন

পার্মেনিদেস বলছেন

ক) কোনো কিছুরই পরিবর্তন হতে পারে না এবং তাই আমাদের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য নয়।

অন্যদিকে, হেরাক্লিটাস বলছেন

ক) সব কিছুই বদলে যায় (‘সব কিছুই বয়ে চলে’) এবং

খ) আমাদের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ নির্ভরযোগ্য।

এর চেয়ে মতপার্থক্য দার্শনিকদের মধ্যে আর কী হতে পারে? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কার কথা ঠিক? নিজেদেরকে তারা যে জটিলতার মধ্যে জড়িয়েছিলেন তা থেকে বেরোবার পথ দেখালেন সিসিলির এম্পিডক্লেস (Empedocles, আনু ৪৯০-৪৩০ খ্রি. পূ.)। তিনি মনে করতেন এদের দু'জনেরই একটি বক্তব্য ঠিক, অন্যটি ভুল। এম্পিডক্লেস দেখলেন যে তাদের মধ্যে মতবিরোধের আসল কারণটি হচ্ছে দুই দার্শনিকই মাত্র একটি মৌলিক পদার্থ বা বস্তুর উপস্থিতির কথা ধরে নিয়েছিলেন। এটা সত্যি হলে প্রজ্ঞার আজ্ঞা আর 'আমরা আমাদের চোখ দিয়ে যা দেখি', এই দুইয়ের মধ্যকার দূরত্বমোচন সম্ভব হতো না।

পানি অবশ্যই মাছ বা প্রজাপতি হয়ে যেতে পারে না। সত্যি বলতে কী, পানির পরিবর্তন হতে পারে না। বিশুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ পানিই থেকে যাবে। কাজেই পার্মেনিদেস একটা কথা ঠিকই বলেছিলেন যে কোনো কিছুই বদলায় না।

কিন্তু ঠিক একই সঙ্গে এম্পিডক্লেস হেরাক্লিটাসের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে বলেছিলেন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর দেয়া প্রমাণ আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে। আমরা যা দেখি তা আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে আর আমরা যা দেখি তা ঠিক এই যে, প্রকৃতি বদলে যায়।

এম্পিডক্লেস এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন যে আসলে একটি মাত্র 'মৌলিক' পদার্থের ধারণাটি পরিত্যাজ্য। পানি বা বাতাস একা একা একটা গোলাপ ঝাড় বা প্রজাপতি হয়ে যেতে পারে না। প্রকৃতির উৎস সম্ভবত কেবল একটি উপাদান হতে পারে না।

এম্পিভক্লেস বিশ্বাস করতেন যে মোটের ওপর প্রকৃতি চারটি মৌলিক উপাদান বা তার কথায় মূল (root) দিয়ে তৈরি। এই চারটি মূল হচ্ছে মাটি, বাতাস, আগুন আর পানি।

সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াই ঘটে এই চারটি মৌলিক উপাদানের সংযোজন আর বিয়োজনের ফলে। কারণ সব জিনিস-ই মাটি, বাতাস, আগুন আর পানির একটি মিশ্রণ, যদিও একেক বস্তুতে এগুলোর অনুপাত একেক রকম। সাদা চোখেই পরিবর্তনগুলো লক্ষ করি আমরা। কিন্তু মাটি আর বাতাস, আগুন আর পানি অক্ষত-ই থেকে যায় সব সময়ের জন্যে, যে-সব যৌগের অংশ হিসেবে এগুলো থাকে সে-সব যৌগ এই চারটি উপাদানকে ছুঁতেও পারে না। কাজেই এ-কথা বলা ঠিক নয় যে সব কিছুই বদলে যায়। আসলে কিছুই বদলায় না। যা ঘটে তা হচ্ছে সেই চারটে মৌলিক উপাদান এক হয়, আলাদা হয়, তারপর আবার এক হয়।

ব্যাপারটাকে আমরা চিত্রাংকনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কোনো চিত্রকরের যদি কেবল একটিই রঙ, যেমন ধরো লাল থাকে তাহলে তার পক্ষে সবুজ গাছ আঁকা সম্ভব হবে না। কিন্তু তার কাছে যদি হলুদ, লাল, নীল আর কালো রঙ থাকে তাহলে তিনি সেগুলো বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে শয়ে শয়ে বিভিন্ন রঙ তৈরি করতে পারবেন।

রান্নাঘর থেকে একটা উদাহরণ দিয়েও ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। আমার কাছে যদি কেবল ময়দা থাকে তাহলে একটা কেক বানাতে রীতিমত জাদুকর হতে হবে আমাকে। কিন্তু আমার কাছে ডিম, ময়দা, দুধ আর চিনি থাকলে আমি যত ইচ্ছা তত রকমের কেক বানাতে পারবো।

প্রকৃতির মূল হিসেবে এম্পিডক্লেস যে মাটি, বাতাস, আগুন আর পানিকে চিহ্নিত করেছিলেন সেটা কিন্তু একদম শুধু শুধু নয়। তার পূর্ববর্তী দার্শনিকেরাও এটা দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে মৌলিক বস্তুকে পানি, বাতাস বা আগুন হতে হবে। থেলিস এবং অ্যানাক্সিমেনিস মন্তব্য করেছিলেন যে পানি আর বাতাস দুই-ই প্রাকৃতিক জগতের অত্যন্ত অপরিহার্য উপাদান। গ্রিকরা বিশ্বাস করত, আগুনও একটি অপরিহার্য উপাদান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমস্ত জীবন্ত জিনিসের

ক্ষেত্রে সূর্যের ভূমিকা কী তা লক্ষ করেছিল তারা। তাছাড়া, তারা আরও জানতো যে জীব-জন্তু এবং মানুষ সবার শরীরেরই তাপমাত্রা রয়েছে।

এম্পিডক্লেস হয়ত এক টুকরো কাঠ জ্বলতে দেখেছিলেন। কিছু একটা বিলীন হয়ে গেল। আমরা সেটার চটচট টুপটাপ আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওটা 'পানি'। কিছু একটা ধোয়া হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওটা হলো বাতাস। আগুন আমরা দেখতে পাই। আগুন নিভে যাওয়ার পরে কিছু একটা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে ছাই বা মাটি। প্রকৃতির রূপান্তরকে চারটে 'মূল'-এর সংযোজন ও বিয়োজন হিসেবে এম্পিভক্লেসের ব্যাখ্যার পরেও এমন একটা কিছু রয়ে গেল যা ব্যাখ্যা করার দরকার ছিল। নতুন জীবন যাতে তৈরি হতে পারে সেজন্য কোন জিনিসটি এই মৌলিক উপাদানগুলোকে সংযুক্ত হতে বাধ্য করে? কোন জিনিসটি এই 'মিশ্রণ'-টিকে, যেমন ধরো একটি ফুলকে, আবার বিলীন করে দেয়?

এম্পিডক্লেস বিশ্বাস করতেন দুটাে ভিন্ন শক্তি প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল। এই শক্তি দুটোকে তিনি বলেছেন প্রেম (love) 3 form (strife)। প্রেম বিভিন্ন বস্তুকে একসঙ্গে বাঁধে, বিবাদ সেগুলোকে পৃথক করে।

'সারবস্তু' (substance) আর 'শক্তি'-র মধ্যেও পার্থক্য নির্ণয় করেছেন তিনি। এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এমনকি আজো বিজ্ঞানীরা মৌলিক উপাদানসমূহ আর প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে ভিন্নভাবে দেখেন। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে, সব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকেই ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক উপাদান আর বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

আমরা যখন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন কী ঘটে? এম্পিডক্লেস এই প্রশ্ন-ও করেছেন। এই যেমন একটি ফুল, সেটাকে আমি কীভাবে দেখি? ঠিক কী ঘটে? ব্যাপারটা কি তুমি কখনো চিন্তা করে দেখেছো, সোফি?

এম্পিডক্লেস বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির অন্যান্য জিনিসের মতো চোখও মাটি, বাতাস, আগুন আর পানি দিয়ে তৈরি। কাজেই আমার চোখের মাটি দেখে আমার চারপাশের মাটিকে, বাতাস প্রত্যক্ষ করে যা কিছু বাতাস তাই, আগুন প্রত্যক্ষ করে যা কিছু আগুন তাই আর 'পানি' যা কিছু পানি তাই। আমার চোখে যদি এই চারটি বস্তুর কোনো একটি না থাকতো তাহলে আমি প্রকৃতির সবকিছু দেখতে পেতাম না।

সবকিছুতেই সবকিছুর কিছু কিছু

অ্যানাক্সাগোরাস (Anaxagoras, ৫০০-৪২৮ খ্রি.পূ.) হলেন আরেক দার্শনিক যিনি এ-কথা বিশ্বাস করতে পারেননি যে একটি বিশেষ মৌলিক বস্তু, যেমন পানি, পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখি তার সব কিছুতে রূপান্তরিত হতে পারে। এ-কথাও তিনি মেনে নিতে পারেননি যে মাটি, বাতাস, আগুন ও পানি পরিণত হতে পারে রক্ত আর হাড়ে। অ্যানাক্সাগোরাস বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি চোখের অগোচর অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য কণা দিয়ে তৈরি। তাছাড়া, প্রতিটি জিনিসকেই আরও ছোট ছোট অংশে ভেঙে ফেলা যায়, কিন্তু এমনকি সবচয়ে ক্ষুদ্র অংশের ভেতরেও অন্য সব জিনিসের অংশবিশেষ থেকে যায়। তিনি মনে করতেন ত্বক এবং হাড় যদি অন্য কিছুর রূপান্তর না হয়ে থাকে তাহলে যে-দুধ আমরা পান করি, যে-খাবার আমরা খাই তার ভেতরেও ত্বক আর হাড় থাকবে।

বর্তমান সময়ের দু'একটা উদাহরণ হয়ত অ্যানাক্সাগোরাসের চিন্তার সূত্র ধরতে সাহায্য করবে আমাদের। আধুনিক লেজার প্রযুক্তি তৈরি করতে পারে তথাকথিত হলোগ্রাম। ধরা যাক এ-সবের কোনো একটি হলোগ্রামে একটি গাড়ির চিত্র আঁকা হলো। এখন যদি হলোগ্রামটি খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলা হয় তাহলে হলোগ্রামটির যে অংশে কেবল গাড়ির বাম্পারটি দেখা যাচ্ছে সে-অংশেও পুরো

গাড়িটির ছবি দেখতে পাবো আমরা। তার কারণ, প্রতিটি ছোট অংশেই পুরো বস্তুটি থাকে।

এক অর্থে আমাদের শরীরও একইভাবে তৈরি। আমার আঙুল থেকে চামড়ার একটা কোষ খসে পড়লে সেটার কেন্দ্রে যে শুধু আমার চামড়ার বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যাবে তা নয়, ঐ একই কোষ বলে দেবে আমার চোখ কোন ধরনের, আমার চুলের রঙ কী, আমার আঙুলের সংখ্যা আর ধরন, ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। মানবদেহের প্রতিটি কোষেই অন্যান্য কোষের একটা ব্লু প্রিন্ট রয়েছে। কাজেই প্রতিটি কোষের মধ্যেই সবকিছুর কিছু কিছু রয়েছে। ক্ষুদ্র অংশের ভেতরেই রয়েছে সমগ্রটি।

এই যে-সব ছোট ছোট কণার ভেতর সবকিছুরই কিছু কিছু বিদ্যমান রয়েছে অ্যানাক্সোগোরাস তার নাম দিয়েছেন বীজ (seed) ।

একটা কথা মনে রেখো যে, এম্পিডক্লেস মনে করতেন 'প্রেম'-ই মৌলিক উপাদানগুলোকে এক সঙ্গে জড়ো করে সম্পূর্ণ বস্তু তৈরি করে। অ্যানাক্সাগোরাস ক্রম'-কেও (order) এক ধরনের শক্তি বলে ভাবতেন যা জীব-জন্তু ও মানুষ, ফুল ও গাছ তৈরি করে। এই শক্তিকে তিনি বলেছেন মন বা বুদ্ধিমত্তা (nous)।

আরেকটি কারণেও অ্যানাক্সাগোরাস মনোযোগের দাবিদার আর তা হচ্ছে, এথেন্সের দার্শনিক হিসেবে তার কথাই প্রথম শুনতে পাই আমরা। এশিয়া মাইনরের লোক ছিলেন তিনি, কিন্তু চল্লিশ বছর বয়েসে এথেন্সে চলে যান। পরে তার বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ আনা হয় এবং তিনি শহরটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি যেসব কথা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে সূর্য কোনো দেবতা নয়, বরং একটি লোহিত-তপ্ত পাথর, যা কিনা গোটা পেলোপনেসিয় উপদ্বীপের চেয়েও ঢের বড়।

জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও বরাবরই বেশ উৎসাহ ছিল অ্যানাক্সাগোরাসের। তিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবী যে-সব বস্তু দিয়ে তৈরি গ্রহ-নক্ষত্র-ও তাই দিয়ে

তৈরি। একটি উল্কা-খণ্ড পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন তিনি। এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে-ও উপনীত হন যে অন্য গ্রহেও মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, সেটার আলো আসে পৃথিবী থেকে। ভেবেচিত্তে সূর্য গ্রহণেরও একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি।

পুনশ্চ তোমার মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ, সোফি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে হয়ত বেশ কয়েকবার না পড়লে এই অধ্যায়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে না তুমি, তবে কথা হচ্ছে, বুঝতে গেলে একটু কষ্ট করতেই হয় সব সময়। তুমি নিশ্চয়ই এমন কোনো বন্ধুকে পছন্দ করবে না যে কোনো কষ্ট না করেই সব কিছুতেই ভালো করে। মৌলিক পদার্থ আর প্রকৃতিতে রূপান্তরের প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো সমাধানের জন্য আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে ডেমোক্রিটাসের। আজ আর নয়!

ঘন ঝাড়ের ভেতর ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে বাইরে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল সোফি তার গুহায় বসে। এতো কিছু পড়ার পর নিজের চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নিতে বাধ্য হলো সে।

এ-কথাটি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, নির্জলা পানি বরফ বা বাষ্প ছাড়া অন্য কিছুতে বদলে যেতে পারে না। পানি এমনকি তরমুজও হতে পারে না, কারণ এমনকি তরমুজের ভেতরেও স্রেফ পানি ছাড়া অন্য বস্তু থাকে। তবে এ-ব্যাপারটা সম্পর্কে সে যে এতো নিশ্চিত সে তো কেবল এই জন্য যে এটাই তাকে শেখানো হয়েছে। যেমন ধরা যাক, বরফ যে পানি ছাড়া অন্য কিছু নয় সে-ব্যাপারে সে কি এতো নিশ্চিত হতে পারতো যদি না সেটা তাকে শেখানো হতো? অন্তত পানি কীভাবে জমে বরফ হয়ে যায় আর তারপর আবার গলে যায় সেটা তাকে খুব ভালো করে লক্ষ করার সুযোগ দেয়া উচিত ছিল।

অন্যদের কাছ থেকে সে কী শিখেছে সে-কথা না ভেবে সোফি আবার নিজের কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করার চেষ্টা করল।

কোনো ধরনের পরিবর্তনের কথা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না পার্মেনিদেস। সোফি যতই এ-নিয়ে ভাবল ততোই তার ধারণা দৃঢ়মূল হলো যে এক অর্থে ঠিকই বলেছিলেন তিনি। পার্মেনিদেসের বুদ্ধিমত্তা এ-কথা স্বীকার করতে চায়নি যে কোনো কিছু হঠাৎ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কিছুতে বদলে যেতে পারে। এভাবে সবার মুখের ওপর কথাটা বলতে নিশ্চয়ই বেশ সাহসের দরকার হয়েছিল তার, কারণ এ-কথা বলার অর্থ লোকে নিজেদের চোখে যে-সব প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখছে সেগুলোকে অস্বীকার করা। অনেকেই নিশ্চয়ই হাসাহাসি করেছিল তার কথা শুনে।

আর এম্পিডক্লেস-ও যথেষ্ট স্মার্ট লোক ছিলেন বটে, নইলে কি আর এ-কথা প্রমাণ করতে পারে যে জগৎ একাধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি? সে-কারণেই কোনো কিছুর পরিবর্তন না হওয়ার পরেও প্রকৃতির সমস্ত রূপান্তর সম্ভবপর হয়।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক স্রেফ যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করেই ব্যাপারটা বের করে ফেলেছিলেন। আলবৎ তিনি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞানীরা যেভাবে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন তা করার মতো যন্ত্রপাতি নিশ্চয়ই তার কাছে ছিল না।

সোফি ঠিক নিশ্চিত নয় সব কিছুরই উৎস যে মাটি, বাতাস, আগুন আর পানি, এই কথাটা সে বিশ্বাস করে কিনা। কিন্তু কথা হচ্ছে তাতে কী আসে যায়? নীতিগতভাবে এম্পিডক্লেস ঠিকই বলেছিলেন। আমরা নিজেদের চোখ দিয়ে আমাদের চারপাশে যে-সব পরিবর্তন দেখি সেগুলোকে আমাদের যুক্তিবোধ নষ্ট না করে স্বীকার করে নেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে একাধিক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের কথা মেনে নেয়া।

দর্শনের প্রতি সোফির ভালোবাসা দ্বিগুণ বেড়ে গেল, কারণ স্কুলে সে যা কিছু শিখেছে সে-সব স্মরণ না করে স্রেফ কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করেই ধারণাগুলো বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না তার। সে এই সিদ্ধান্তে পৌছুল যে, দর্শন শেখার কোনো বিষয় নয়; তবে সম্ভবত দার্শনিকভাবে চিন্তা করাটা শেখা যেতে পারে।

If you want more story about shishu-kishor so, please visite

www.shishukishor.org